যুগান্তর
প্রিন্ট: ০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১১:০৩ এএম

শিক্ষাঙ্গন

বিশ্ব শিক্ষক দিবসে দুই অনন্য শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা

ড. জিশান আরা আরাফুন্নেছা
প্রকাশ: ০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১২:১৭ এএম

কোনো কোনো শিক্ষক আকাশের উদারতা আর সমুদ্রের গভীরতা নিয়ে শিক্ষার্থীদের মনে স্থায়ী আসন পেয়ে অমরত্ব লাভ করে থাকেন। এমন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ গত শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে দেদীপ্যমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন স্বনামধন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ ও অধ্যাপক নাজমা চৌধুরী। এ দুজন স্বনামধন্য শিক্ষক মোটামুটি কাছাকাছি সময়ে ইহলোক ত্যাগ করেন। আমার সৌভাগ্য, আমি এ দুজন শিক্ষককেই অনেক কাছ থেকে দেখেছি, তাদের উপদেশ পেয়েছি, তাদের প্রজ্ঞার ছোঁয়ায় ধন্য হয়েছি।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এমাজউদ্দীন স্যারের মতো এমন পিতৃতুল্য স্নেহশীল শিক্ষকের সন্ধান পাওয়া ভার। স্যারের সংস্পর্শে তার যত শিক্ষার্থী এসেছেন, সবাই এ কথা স্বীকার করবেন। আমি স্যারের সামনে আসার প্রথম সুযোগ পাই ১৯৭৭ সালে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ট্র্যাডিশনাল সিস্টেমের সম্মান দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী হিসাবে। তার টিউটোরিয়াল গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুবাদে। সেই থেকে স্যারের সঙ্গে কত স্মৃতি জড়ানো! তিনি নিয়ম মেনে সময়মতো লেখাপড়ার কথা মনে করিয়ে দিতেন প্রায়ই। কাউকে বকা দিতে গেলে কিংবা তাগিদ দেওয়ার দরকার হলে স্যার যেভাবে দরদ দিয়ে কাজটা সারতেন, আমি এমনটি আর কারও মধ্যে পাইনি। অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমেদ আরেক ক্ষেত্রে অনন্য ছিলেন, যা হলো বড় কোনো বিষয়বস্তুকে অল্প কথায় প্রকাশ করতে পারা। তিনি যখন কথা বলতেন, কার সাধ্য ছিল তার বক্তব্যের প্রতি মনোযোগ না দিয়ে পারে!

স্যারকে ঘিরে অনেক স্মৃতির মধ্যে একটা ঘটনা আমাকে দারুণভাবে উদ্বেলিত করে। বেশ কয়েক বছর আগে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ চুকেছে। কর্মজীবনের শুরুর দিকে ব্রিটিশ সরকারের অর্থায়নে ১৯৯০-৯১ শিক্ষাবর্ষে যুক্তরাজ্যের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাই। সেখানে ভর্তির জন্য দরকার আমার সর্বশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষকের রেফারেন্স লেটার। নিজের সম্পর্কে কিছু ভালো ভালো কথা লিখে একখানা রেফারেন্স লেটারের ড্রাফট করে ছুটলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে। শিক্ষকদের কাছে গিয়ে হতাশ হলাম। ভগ্ন হৃদয়ে, অশ্রুসিক্ত নয়নে ডিপার্টমেন্ট থেকে নিরাশ হয়ে বের হয়েছি নিজ অফিসে ফিরে যাব বলে। রেজিস্ট্রার'স বিল্ডিং পার হওয়ার সময় হঠাৎ মনে হলো, এখানে তো এমাজউদ্দীন স্যার আছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য স্যার তো প্রকৃতই ব্যস্ত। তথাপি সাহস করে স্যারের কাছে গেলাম।

‘কী রে মা, কেমন আছিস? কেন এসেছিস?’ শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকের সেই চিরাচরিত হৃদয়প্লাবক সম্বোধন! স্যারকে সংক্ষেপে আমার আসার কারণ বলে রেফারেন্স লেটারের খসড়াটা এগিয়ে দিলাম। তিনি একবার নজর বুলিয়ে ওটা ফিরিয়ে দিয়ে আমাকে অপেক্ষা করতে বললেন তার রুমেই। এরপর নিজ হাতে অতি সংক্ষেপে একখানা ড্রাফট্ লিখে তার পিএ সাহেবকে টাইপ করতে দিলেন। মনে মনে ভাবছিলাম, এত সংক্ষেপে স্যার কী লিখলেন! ‘নে মা, তোর রেফারেন্স লেটার’-স্যারের স্নেহমাখা আহ্বানে আমার চিন্তার জাল ছিড়ে গেল। যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে উপ-উপার্চাযের লেটারহেড প্যাডে লেখা চিঠিখানা স্বাক্ষর করে নিজ হাতে খামে ভরে স্যার আমাকে দিলেন। দশ মিনিটের মধ্যেই আমার কাজ হয়ে গেল। বিদায়কালে স্যার আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, ‘ভালো করে লেখাপড়া করিস রে, মা।’

স্যারের রুম থেকে বেরিয়ে রেজিস্ট্রার’স বিল্ডিংয়ের মাঠে বসে চিঠিখানা পড়লাম। আজও সেই চিঠির কথাগুলো আমার মনে গেঁথে আছে : ‘I certify that…is my direct student at the University of Dhaka. I am confident that she is capable of undertaking higher studies from any world-class university. I wish her…।’ আমার মতো একজন মধ্যম মানের শিক্ষার্থী সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপার্চাযের এমন উচ্চমানের সার্টিফিকেট! তিনি ব্যস্ততার দোহাই দিলেন না, প্রায় একযুগ আগে শিক্ষাঙ্গন ছেড়েছি বলে চিনতে না পারার সহজ অজুহাত তুললেন না। আমি আনন্দে চোখ মুছতে মুছতে গন্তব্যে পা বাড়ালাম। তিনিই আমাদের শ্রদ্ধাভাজন এমাজউদ্দীন স্যার!

এমাজউদ্দীন আহমদ ১৯৩৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর মালদহ, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, ব্রিটিশ ভারতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজশাহী কলেজে পড়ালেখা করেছেন। পরে কুইন্স ইউনিভার্সিটি অ্যাট কিংসটন থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। তার বর্ণাঢ্য জীবন অনেক ঘটনাবহুল। শিক্ষকতাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কয়েকটি কলেজে শিক্ষকতা করে ১৯৭০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে সিনিয়র লেকচারার হিসাবে যোগদান করেন। তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য এবং ১৯৯২ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত উপাচার্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসরগ্রহণের পর তিনি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অলটারনেটিভের (ইউডা) উপাচার্য হিসাবে দীর্ঘসময় (২০০২-২০১৬) দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি ছিলেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান ও সৃজনশীল লেখালেখির জন্য তিনি দেশে-বিদেশে বিশেষভাবে সম্মানিত হয়েছেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনেক পুরস্কার ও সম্মাননা অর্জন করেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৯২ সালে তিনি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক একুশে পদকে ভূষিত হন।

এমাজউদ্দীন আহমদ স্যার দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে তুলনামূলক রাজনীতি, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ও দক্ষিণ এশিয়ার সামরিক বাহিনী সম্পর্কে গবেষণা করেছেন। এসব ক্ষেত্রে সমগ্র এশিয়ায় তিনি বিশেষজ্ঞ হিসাবেও সর্বজনবিদিত। বাংলা-ইংরেজি মিলিয়ে তার লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা অর্ধশতাধিক। দেশ-বিদেশের বিখ্যাত সব সাময়িকীতে তার প্রকাশিত গবেষণামূলক প্রবন্ধের সংখ্যা শতাধিক।

অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ ২০২০ সালের ১৭ জুলাই ওপারে চলে গেছেন। আমাদের শ্রদ্ধাভাজন স্যার তার সব ছাত্রকে যেমন স্নেহছায়ায় আশ্রয় দিয়ে আগলে রাখতেন, পরম করুণাময়ও যেন তার দয়ার আশ্রয়ে আমাদের পিতৃতুল্য এ শিক্ষককে বেহেশতের সর্বোচ্চ স্তরে দাখিল করেন-কায়মনে এ প্রার্থনা করি নিরন্তর।

আমার আরেকজন শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক হলেন অধ্যাপক নাজমা চৌধুরী-এ লেডি উইথ গ্রেস। ম্যাডামের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্দেশনা ছাড়া আমার মতো একজন সাধারণ মেধাসম্পন্ন গবেষকের পক্ষে কখনই পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন সম্ভব ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত পড়ালেখা শেষ করে কর্মজীবনে সরকারি বৃত্তি নিয়ে ব্রিটেন থেকে আরেকটা মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেছিলাম। সেখানেই পিএইচডি পর্যায়ের অধ্যয়নের সুযোগ হয়েছিল। কিন্তু ঘর-সংসার ও পেশাগত দায়িত্ব ইত্যাদির কথা চিন্তা করে দেশেই এ ডিগ্রির জন্য চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফিরে আসি। বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ার অনেক বছর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে পিএইচডি পর্যায়ে অধ্যয়নের জন্য ভর্তি হতে চাচ্ছিলাম। একটা গবেষণা প্রস্তাবনা তৈরি করে শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ স্যারের সঙ্গে দেখা করলাম। আমার প্রস্তাবনাটি দেখেই তিনি আমাকে নাজমা চৌধুরী ম্যাডামের তত্ত্বাবধানে কাজ করার উপদেশ দিলেন। ম্যাডামের নাম বলার সঙ্গে সঙ্গে আমি বলে উঠলাম, 'স্যার, তার কাছে যেতে যে ভয় লাগে। আর ম্যাডাম আদৌ আমার গবেষণার তত্ত্বাবধান করতে রাজি হবেন কিনা!' 'তোর কোনো চিন্তা নেই, মা।

নাজমাকে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। ও তো সত্যিকারার্থে একজন আদর্শ শিক্ষক; নিবেদিতপ্রাণ গবেষক। আর মহিলাদের নিয়ে তোর এ গবেষণার প্রস্তাব সে খুব আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ করবে বলে আমার বিশ্বাস।' আমাকে আশ্বস্ত করলেন স্যার। কথা শেষ করেই ম্যাডামের সঙ্গে ফোনে কথা বললেন। ম্যাডামের কাছ থেকে সময় জেনে স্যার আমাকে গবেষণা প্রস্তাবনাসহ তার সঙ্গে দেখা করতে বললেন।

আমি নির্দিষ্ট দিনে ম্যাডামের বাসায় হাজির হলাম। আমার নাম-পরিচয় শেষ করার আগেই ম্যাডাম আমার গবেষণা প্রস্তাবনাটি দেখতে চাইলেন। আমি এদেশের প্রশাসন ক্যাডারে যোগদানকারী প্রথম ব্যাচের মহিলা কর্মকর্তাদের একজন। আমার গবেষণার বিষয়টিও এ ক্যাডারের মহিলা আধিকারিকদের ওপর। তিনি গভীর মনোযোগে সেটি দেখে অল্প কথায় আমাকে খুব উৎসাহিত করলেন।

আমি শিক্ষা ছুটি না নিয়ে আমার পড়ালেখা করেছি। তাই আমার গবেষণা শেষ করতে একটু বেশি সময় লেগেছিল। কিন্তু সময় বাড়ানোর ব্যাপারেও তিনি আমাকে খুব সাহায্য করেছেন। নইলে আমাকে মাঝপথেই হাল ছেড়ে দিতে হতো। মাঝেমাঝে মনে হয়েছে, এমন একটা নিবিড় গবেষণার কাজ আমার মতো একজন সংসারী, সার্বক্ষণিক চাকরি ও মধ্যমানের মেধাসম্পন্ন ছাত্রীর জন্য নয়। আমাদের দেশের অনেক প্রতিভাময়ী নারীর অধিকাংশ সম্ভাবনাই পারিবারিক আর সামাজিক দায়বদ্ধতার নিগড়ে নিঃশব্দে ঝরে পড়ে। আমার ক্ষেত্রেও তেমনটিই হতো-যদি আমার শ্রদ্ধাস্পদ এ শিক্ষক আমাকে নিরন্তর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা না দিতেন বা সাহায্য না করতেন। তাই বলে তিনি আমার গবেষণায় ছাড় দেননি কিছুই। পিএইচডির গবেষণার ওপর সেমিনার দেওয়া, নিজে সে সেমিনারে পর্যবেক্ষক হওয়া আর সেমিনারে উপস্থিত বিজ্ঞজনদের অভিমত আমার লেখায় ঠিকঠাক জুড়েছি কিনা, তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা-এসব ক্ষেত্রে এতটুকুও শৈথিল্য করতে দেননি।

অধ্যাপক নাজমা চৌধুরী একজন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন কঠোর ব্যক্তিত্বের অধিকারী মহিয়সী নারী। ম্যাডামকে আমরা সবাই অনেক ভয় পেতাম তার কঠোর ব্যক্তিত্বের কারণে। চল্লিশের দশকের প্রথমার্ধে সিলেট জেলায় জন্মগ্রহণকারী এ নারী দেশ ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি তার শিক্ষাজীবনের সব পাবলিক পরীক্ষায় অসাধারণ মেধার পরিচয় দিয়েছেন। তার সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় জানতে পেরেছি, কূটনৈতিক পেশায়

আগ্রহ থাকলেও তার সময়ে সেসব দ্বার মহিলাদের জন্য বন্ধ ছিল। তাই শেষ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শীর্ষস্থান অধিকার করে এ বিভাগেই শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন ১৯৬৩ সালে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে তিনি ১৯৮৪-৮৭ মেয়াদে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে নারী উন্নয়ন ও রাজনীতি সম্পর্কিত কোর্স প্রবর্তন করেন। সমাজে নারীর কাঙ্ক্ষিত ও প্রকৃত অবস্থান বিশ্লেষণের মানসে তিনি এসব বিষয়ে এমফিল ও পিএইচডি পর্যায়ের গবেষণায় শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করেন। অধ্যাপক চৌধুরী ১৯৮৮ সালে ফুলব্রাইট ফেলোশিপের আওতায় যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং স্কলার হিসাবে শিক্ষকতা করেন। তিনি ২০০০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন।

অধ্যাপক নাজমা চৌধুরী শিক্ষকতার পাশাপাশি নারী উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও গবেষণায় অসামান্য ভূমিকা রেখেছেন। লেখালেখিও করেছেন বিস্তর। দেশে-বিদেশে তার অনেক গবেষণালব্ধ প্রকাশনার মধ্যে অধ্যাপক বারবারা নেলসনের সঙ্গে তার যৌথ সম্পাদনায় আমেরিকার ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত ‘Women and Politics Worldwide’ গ্রন্থটি ১৯৯৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ প্রকাশনা হিসাবে স্বীকৃত হয়। বিশ্বের ৪৩টি দেশের নারীদের রাজনৈতিক অবস্থান ও ক্ষমতায়নের বিশ্লেষণধর্মী সমীক্ষা এতে স্থান পেয়েছে। এ বইয়ের জন্য আমেরিকান পলিটিক্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন থেকে ১৯৯৫ সালে তিনি ‘ভিক্টোরিয়া সাক’ পুরস্কার লাভ করেন।

অধ্যাপক নাজমা চৌধুরী ১৯৭৮ ও ১৯৮৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে, ১৯৮০ সালে ইউনেস্কোর সম্মেলনে এবং ১৯৮৫ সালে নাইরোবি বিশ্ব নারী সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দেশের স্বেচ্ছাসেবী নারীদের সংগঠিত করার জন্য তিনি ১৯৯৩-৯৫ সালে বেসরকারি এনজিও ফোরামের চেয়ার ও সরকারের প্রিপারেটরি কমিটির প্রতিনিধি হিসাবে বেইজিংয়ে চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে যোগ দেন। তিনি ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি

কমিশন ২০০৭ সালে তাকে ‘রোকেয়া চেয়ার’ সম্মাননায় ভূষিত করে। পরের বছর অর্থাৎ ২০০৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানজনক ‘প্রফেসর এমিরিটাস’ পদে উন্নীত হন। একই বছর ‘একুশে পদকে’ ভূষিত হন এ স্বনামধন্য শিক্ষাব্রতী।

করোনায় আক্রান্ত হয়ে ২০২১ সালের ৮ আগস্ট তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। প্রকৃতির অমোঘ বিধানে অধ্যাপক নাজমা চৌধুরী ওপারে চলে গেলেও তার আদর্শ, সততা ও নিষ্ঠা দিয়ে অসংখ্য শিক্ষার্থীর মাঝে তিনি বেঁচে থাকবেন যুগ থেকে যুগান্তরে।

ড. জিশান আরা আরাফুন্নেছা: অবসরপ্রাপ্ত সচিব